‘সময়ের তীর’ ও জীবনানন্দের সময়ভাবনা (প্রবন্ধ)

আহমদ রফিক

স্থান, কালের ধারণা ও সৃষ্টিরহস্য নিয়ে একদা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, যদিও বিষয়গুলোছিল মূলত বিজ্ঞানের। এর মধ্যে কবিদের কাউকে কাউকে হৃদয় নয়, মেধা ও মনন ব্যবহার করে নিজ নিজ ধ ারণা প্রকাশ করতে দেখাগেছে। তাই অবাক হবার থাকে না যদি সেই মধ্যযুগেও কোনো দার্শনিক-কবি উল্লিখিত কোনো কোনো বিষয় নিয়ে কিছু মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন, সঙ্গে মতামতও। এখন অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবল জটিলত ার কারণে বিষয়টা প্রধানত বিজ্ঞানীদের হাতেই চলে গেছে। তবু কবি বা দার্শনিক কাউকে কাউকে এই জটিলতার মধ্যেও উঁকি দিতে দেখা যায়।

বাংলা কবিতায় বিজ্ঞান চেতনার উজ্জ্বল প্রকাশ যে রবীন্দ্রনাথের হাতে সে তথ্য রবীন্দ্র পাঠকের অজানা নেই। উত্তর-রৈবিকবাংলা কবিতায় এই প্রকাশ অনেকটাই পরোক্ষ। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের কবিতার সময় ও প্রাকৃতিক জগৎ এতটা ব্য াপ্তি ও বৈচিত্র নিয়েপ্রকাশ পেয়েছে যে তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানচেতনা শৈল্পিক বোধে পরিস্রুত হয়ে ওঠার কারণেএর তাৎপর্য একটু ভেবেচিন্তে বুঝে নিতে হয়। এদিক থেকে জীবনানন্দ পাঠ খুব একটা সহজ থাকে না।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, বস্তুজগৎ বা জীবজগৎ নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণায় বিজ্ঞানের হিসাব নিকাশ এতটা দ্রুত পাল্ট াতেশু করেছে যে-- কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে সর্বশেষে ধারণায় পরিচয় না নিয়ে বিজ্ঞানের সত্যকে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না, অর্থাৎ সে জানা সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের চোখেও সত্য আপেক্ষিক বলে ক’দিন আগেকার সত্য অনেক সময় পরবর্তী সময়ে বাতিল হয়ে যায়, সেখানে নতুন সত্য দেখা দেয়, বলা যেতে পারে সত্যের নয়াপ। ‘সময়’কে একদা ‘পরম’ (অ্য াবসলিউট) জ্ঞান করা হতো, কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্বের বিচারে সে ‘সময় ধারণা’ পালটে যায়, সময় হয়ে ওঠে ব্যক্তি-ধারণ া-নির্ভর, এক আপেক্ষিক অস্তিত্ব যা অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল।

স্থান কাল সম্পর্কে ইতোমধ্যে পূর্ব-ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেখা যাচ্ছে, ‘সময়’ প্রকৃ তপক্ষে ‘স্থান’ থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নয়, তেমনি নয় স্থানও । স্থানকালের সমন্বিত অস্তিত্বই এখন বিজ্ঞানের সত্য হিসেবে স্বীকৃত। অন্যদিকে বস্তুর ‘ত্রিমাত্রা’ যে তার অবস্থান নির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় সে সম্পর্কেও আর কোনো সন্দেহ থাকছে না। বস্তু প্রচলিত তিনমাত্রার ধারণা অতিক্রম করে সময়কে নিয়ে চারমাত্রায় পৌঁছে গেছে। এমন কি সেখানে নব্যবিজ্ঞানীর হাত দিয়ে আরো একাধিক মাত্রার সংযোজন ঘটে গেলেও হয়তো অবাক হবার কিছু থাকবে না।

সময়ের সংশ্লিষ্ট তাই বস্তুজগতের সঙ্গে অনিবার্য হয়ে ওঠে এক ধরনের পরস্পর নির্ভরতায় অথবা বলা যায় পারস্পরিকত ায়। স্বভাবতই স্থানকালের ধারণা বাদ দিয়ে বিশ্ব কোনো ঘটনার কথা ভাবা যায় না। ধরে রাখা যায় না বস্তুজগৎ সম্পর্কে সনাতন ধারণা, যে বিশ্ব অপরিবর্তনীয় এবং নির্দিষ্ট স্থির নিয়মে ধৃত তার এই অস্তিত্ব। বরং প্রচলিত ধারণা থেকে সরে এসে ভাবতে হয় যে বিশ্ব শুধু গতিশীলই নয়, ক্রম-প্রসারণশীলও তার অস্তিত্ব। এর শু সম্ভবত সময়ের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে।

স্থানের অন্তহীনতা থেকে বিশ্বের সূচনা নয়, বরং স্থানকালের সুনির্দিষ্টতা থেকে এর উদ্ভব যার মধ্যে সীমানা (বাউন্ডারি)র কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বস্তু থেকে এর সুক্ষ্মতম পর্যায়ে বস্তুকণার আচরণ বা বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার রাজত্ব, যা মহাবিশ্বজগৎ সম্পর্কেও সত্য এবং এক অপরিহার্য মৌল বৈশিষ্ট্য হিসেবে। এই অনিশ্চ

য়তার মধ্য দিয়েই সব কিছুর স্থিতি। সেক্ষেত্রে এমন ধারণা তো কবি বা দার্শনিকের মনে আসতেই পারে যে, মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু অর্থাৎ সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সময় মুহূর্তগুলোকে ঐ অনিশ্চয়তাই ধরে রেখেছে। তাই বিশ্ব প্রকৃতি যে স্থির নিয়মের রাজত্ব এমন বিশ্বাস তখন আর ধরে রাখা যায় না।

কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোয় এই অনিশ্চয়তা সূত্রকে টেনে এনে বিজ্ঞানীদের পক্ষে একটি বিষয় স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়েছে যে, আপাত-অবিশ্বাস্য অনিশ্চয়তার মধ্যে বস্তুকণার অবস্থান ও গতি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং এদের রয়েছে এক সমন্বিত চরিত্রের অস্তিত্ব। স্বভাবতই সে খুঁজে ফিরছে সেই সমগ্রতার ভিত্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের অন্বেষাও বস্তুজগতের সত্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের এককতার বদলে সমগ্রতার জন্যই। যেমন মানবিক জগতে ব্যক্তি থেকে সমষ্টি অধিকতর গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল ধারণায় তাই বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের স্থলে সমষ্টি বা 'প্যাকেট' (কোয়ান্টাম) আলোর আচরণ নিয়ে একক হিসেবে সত্য হয়ে উঠলেও সাধারণ বস্তুকণা সম্পর্কেএ তা ভিন্ন নয়। আর অনিশ্চয়তা-সূত্রের ভিত্তিতে যদি এমন কথাও ভাবতে হয় যে বস্তুকণা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তরঙ্গের মত আচরণ করে এবং তরঙ্গ কণার মত, তাহলে সমন্বয়ের সত্যটাই বড়ো হয়ে ওঠে। দ্বৈত চেতনার মধ্যেও দেখা যায় সব কণাই এক অর্থে তরঙ্গ। প্ল্যাঙ্কের আলোক তরঙ্গ তখন বিশেষ অর্থে কণাসমষ্টি তথা কণাতরঙ্গ হয়ে যায়।

দুই

মানববিশ্বে জীবনযাত্রার পথে যেমন সঙ্গী (পার্টনার), মন দেওয়া নেওয়ার সাথী, বস্তুজগতেও তেমনি প্রতিটি কণার রয়েছে বিপরীত চরিত্রের প্রতিপ (মানবমানবীর বিপরীত লিঙ্গের মতনই)। কোনো সময়ে কণা প্রতিকণা এই দুইয়ের সংঘাতে বস্তুকণার ধবংস বা লয় সম্ভব যেমন মানব মানবীর চেতনার বৈপরীত্যে সংঘাত থেকে বিচ্ছেদ হল প্রেমের লয়। তবে সব সময়ে নয়, সবক্ষেত্রে নয়। নতুন সৃষ্টিও সেক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তা না হলে তো আলো-আঁধারের বৈপরীত্য পেরিয়ে নতুন প্রভাব দেখা দেবার কথা নয়।

এই সূত্রের দূরচিন্তায় সর্বাধুনিক চেতনার বিজ্ঞানীর এমন কথা মনে হতে পারে যে, বস্তুকণা দিয়ে যদি ব্যক্তিমানুষ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে প্রতিকণার সাহায্যেও প্রতিমানুষ তৈরি সম্ভব হতে পারে এবং এই ধারাবাহিকতা নিয়ে একদিন প্রতি-পৃথিবীর সৃষ্টিও অসম্ভব কিছু নয়। আপাতত এমন সম্ভাবনা বিজ্ঞান-ফ্যান্টাসি মনে হলেও ভবিষ্যত সময় হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এসব কথা বা সম্ভাবনা থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসছে যে আপাত-বিজোড় আসলে জোড়েরই অন্য এক তাত্ত্বিক প, য ার বাস্তবতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখানেও কিন্তু সেই সমন্বয়ের কথা, সমগ্রতার ধারণাই এসে যায়।

বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের অন্বেষার মধ্য দিয়ে এই সমন্বয়ের পটাই যেন ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন শক্তির নানা পে, বস্তু থেকে শক্তি ও শক্তি থেকে বস্তুর পান্তর তেমনি কণা ও তরঙ্গের প প্রতিপে। সব মিলিয়ে এক মহাসমন্বয়ের ধারণা বিজ্ঞানীর মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে যখন তার চোখের সামনে ঘটে চলেছে শক্তির হ্রাস থেকে হালকা কণা বা প্রতিকণার উদ্ভব, যখন দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে তৈরি ভগ্নাংশ কণিকা আর প্রতি-ইলেকট্রনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এমনি সব উদ্ভটত্ব দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের বস্তুজগতে। এভাবে প-প্রতিপের মধ্য দিয়ে, শক্তির সমতা বিধানের মধ্য দিয়ে, অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর বস্তুজগতের সম্ভাবনা তৈরি হয় তার শু বা শেষ থাকে না বলে স্রষ্টার ধারণাও অর্থহীন হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি বস্তু থেকে প্রতিপী জীবনের অভিব্যক্তি সম্ভব হতে পারে যদি অবশ্য বস্তু কণার গতি বিপরীত দিকে, পিছন দিকে তাড়িত করা যায়, সময়ের দিক নিশানাও তখন পেছন দিকে চলবে। কিন্তু বাস্তবে সম্ভব হয়নি গ্রহান্তরে তেমন কোনো জীবনের প্রকাশ।

সময়ের তীর তার একমুখী চরিত্রই নিশ্চিত করে থাকে। অতীত থেকে ভবিষ্যতকে বিচ্ছিন্ন করে সময়ের অগ্রসর যাত্রার দিকনিশানা ঠিক করে দেয়। ঘটনার সময় নির্ভর এ পরিবর্তন তথা বিশৃংখলার ক্রমবর্ধমান পই (এনট্রোপি) প্রকৃতপক্ষে 'সময়ের তীর' যেভূতভবিষ্যতকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে দেয়। বিশৃংখলা শব্দটা এখানে ভিন্ন রকম শোনালেও এটা অ াসলে সময়ান্তরের কথা, সময়ের পরিবর্তন অর্থাৎ এক সময় থেকে অন্য সময়ে যাওয়ার কথা। গাছে ফুটে থাকা ফুল সৌন্দর্যের প্রতীকই নয়, একটি সুশৃংখল অবস্থার প্রতীক। কিন্তু তার ঝরে যাওয়ার অবস্থান্তর সময়ের বিচারে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা, এক মুহূর্তে যাত্রা। সে যাত্রা সামনের দিকে, পেছনের দিকে নয়। কারণ ফুলটাকে ইচ্ছা করলেই তার আগের অবস্থানে অর্থাৎ অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, আগের অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না।

'সময়ের তীর' বাস্তব জগতে এভাবেই অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে তার দিকনিশানা নির্দিষ্ট করে থাকে। জলস্রোত যেমন তার তরঙ্গের ওপর ভর করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে পেছন দিকে ফিরে তাকায় না। অর্থাৎ 'সময়ের তীর' সময়ের গতিনির্দেশক। থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র এই একই কথা বলে। ঘটনা সময়ের হাত ধরে বিশৃঙ্খলা তথা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একদিকে গতি নির্দেশ করে, যেমন জীবন সময়ের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যায়।

সময়ের এই পরিবর্তন মানুষের বোধে ধরা পড়ে মস্তিষ্কের ক্রিয়ায়, ঘটে যাওয়া সময় অর্থাৎ অতীত স্মৃতির প নিয়ে, কিন্তু অঘটিত ভবিষ্যত নিয়ে নয়। সময়ের তত্ত্বগত ধারণা যদি মানব চেতনায় প্রতিফলিত হতে পারে তাহলে ভাবা যায় অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মও মানবমনে ধরা দিতে পারে, চেতনে বা অবচেতনে যেভাবেই হোক। বস্তুজগতের প্রসারণও যদি ঐ সময় াস্তরের দিকেই হয়ে থাকেতাহলে এক সময় বস্তুর অবশেষ প, তার আদি অন্তের নিয়মও মানব চেতনায় ভেসে উঠবে। ত াহলে এমন ধারণাই কি ঠিক হবে যে সময় যেমন একদিকে চলে বস্তুও তেমনি প্রসারণের দিকেই চলবে, পেছন ফিরে সংকে াচনের দিকে চলবে না যে অবস্থায় মানবভুবন লয় পেতে বাধ্য।

এই দার্শনিক প্রশ্নের তখন জবাব পাওয়া সম্ভব হতে পারে যে এ ঝি কী, এবং কেন এর উপস্থিতি, কোন্ প্রয়োজনের টানে? তবে জবাব মিলতে প্রয়োজন হবে তত্ত্বেরও সমগ্রতা অর্জন। একটি পূর্ণ সমন্বিত তত্ত্বই পারে ঝিলোক ও মানবলোক বিষয়ক সকল যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব পরিবেশন করতে। বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা এখন সেদিকেই। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দূরেই রয়ে গেছে। এখনো তা ভাসমান তত্ত্বের মতই।

তিন

কবিতার সঙ্গে সময়ের এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টি রহস্যের অতি জটিল তাত্ত্বিকতার সম্পর্ক পাঠকের কাছে অতিকল্পনা মনে হতে পারে। কিন্তু মুশকিল যে কবি জীবনানন্দ নিজেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এমন কথা উচচারণ করে যে,

সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা
লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে
বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময় চেতনার নতুন মূল্য
আবিষ্কৃত হতে পারে।

জীবনানন্দের সময় চেতনার গুত্ব বুঝতে কথাগুলোর শাব্দিক অনুধাবনও জরি।

একজন কবির চেতনা আধুনিকতা ও বিজ্ঞানবোধে সিক্ত হলেই এমন কথা বলা সম্ভব। ঠিকই সময় চেতনা ক্রমশ নতুনবে াধের, নতুন মাত্রা অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে, যেখানে মহাসৃষ্টি থেকে মানবসৃষ্টির কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট বহুপরিচিত প্রশ্নগুলোর জবাবও মিলতে পারে। তখন মানুষের নিজস্ব ছোটখাট বৃত্তের বিষয় সমাজ, ইতিহাস, জীবন সম্পর্কিত ধারণাও সময়ের হাত ধরে হয়তো প্রসারিত হতে পারবে। জীবনানন্দের সময় সত্যের পও নিজেকে বুঝে নিতে পারবে।

যে কারণেই হোক, অর্থাৎ বিজ্ঞানের আধুনিকতম সময়-সৃষ্টি বিষয়ক ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে বা না হয়েই হোক, জীবনানন্দ দাশ সময় ও সৃষ্টি নিয়ে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন, প্রাকৃতিক জগতকে মানবিক বস্তু-জগতের সঙ্গে একাকার করে নিয়ে। একজন স্বপ্নচারী রোমান্টিক কবি, একজন স্বভাব প্রেমিক কবির চৈতন্যে এমন আলোড়ন অস্বাভা বিক মনে হতে পারে। তবু তার সম্পর্কে একথাই সত্য যে জীবনানন্দের বোধের জগত ছিল বহুমাত্রিক। তাই রোমান্টিকত ার অভিসার কিছুটা নিস্তেজ হয়ে এলে 'নক্ষত্রের তিমির আর আগুন' দুই-ই তাঁকে টানতে থাকে। সেই সঙ্গে শু হয় সময়ের তীরে সৃষ্টির ও জীবনের অবশেষ অর্থ নিয়ে ভাবনা। ভাবনা মূলত সময় থেকে সময়ে যাওয়া নিয়ে, অন্ধকার থেকে আলোতে বা আলো থেকে অন্ধকারে আসা-যাওয়া নিয়ে।

মূলত কবিতার মধ্যপর্ব থেকে এবং বিশেষভাবে 'সাতটি তারার তিমির' এ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে উল্লিখিত ভ াবনাই তাঁর কবিতাভাবনাকে জড়িয়ে রেখেছে, ডালপালা মেলে দিয়ে জটিলতা থেকে জটিলতার মধ্যদিয়ে আকাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছে। বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের মত কবিও সৃষ্টির পেছনে যৌক্তিক অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তেমনি জীবনের ক্ষেত্রেও।কোথা থেকে আসা এবং কেন আসা-- এ চিরন্তন প্রশ্ন জীবনানন্দকেও আলোড়িত

করেছে, কখনো তাড়িত করেছে। কিন্তু এর সদুত্তর পাওয়া যায় না। অন্তত যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর। জীবনানন্দও হয়তো পাননি, তবু অন্বেষাকে, ভাবনাকে আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির দিকে নিয়ে গেছেন নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত এনে। সে সম্ভাবনা যতটা ভাববা দিতামুখী, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানমুখী।

তবু উত্তর পাওয়া যায় না বলে নৈরাশ্যচেতনা প্রাধান্য পায় যা জীবনানন্দের সংশ্লিষ্ট প্রদীর্ণ কবিতায় নানামুখী সংশয় নিয়েপ্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতার সিংহভাগ এই সব প্রশ্ন ও জবাবের ভাবনা নিয়ে বৈপরীত্যে জটিল। আর জটিল বলেই 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়- দ্বেষ' কিংবা অন্ধকার বা মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা- এমন ভাবনায় তিনি নিঃসংশয় হতে প ারেননি। তাই একবার নক্ষত্রের দিকে, একবার প্রান্তরের দিকে তাঁর গভীর দৃষ্টি-- চৈতন্যের নিরালোকে আলো জ্বালাবার চেষ্টায় চালিত। বুঝতে পারেন যে, বিজ্ঞানের সূত্র একবার সত্য থেকে মিথ্যায় পরিণত হয়ে আবার নতুন সত্যকে ধরতে চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য অবশেষ খুঁজে পাওয়া।

হয়তো এমনি নানা কারণে বিজ্ঞানের ঐ অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মত জীবনানন্দের ভাবনাও সময়, সৃষ্টি, মানব জীবন ইত্যাদি মৌল বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তায় দোলায়িত হতে থাকে। কিছুতেই যেন শেষ অনুধাবনায় পৌঁছানো যায় না। তাঁর সাতটি ত ারায় যত তিমিরই থাকুক কিংবা অন্ধকারের গভীরে ঘুমোবার সাধ তাঁর যত তীব্রই হোক, পাশাপাশি চৈতন্যে এমন বিশ্বাসও জেগে থাকবে যে

অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;

মাঘসংক্রান্তির রাতে তাঁর এই অনুভব সময়, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতীকে উজ্জ্বল জীবনের প্রত্যাশায়। তঁ ার বিশ্বাস 'মহাবিশ্ব একদিন মহাসংকোচনের মধ্য দিয়ে তমিস্রার' প নিলেও একসময় প্রসারণ পর্যায়ে পৌঁছে জীবনের উপযে াগী উষ্ণ ও আলোকিত হয়ে উঠবে। সেখানে রোদ, পৃথিবী, প্রকৃতি এক গভীর পারস্পরিকতায় উষ্ণ মানবিক পরিবেশ তৈরি করবে মানব-মানবীর জন্য। জীবনানন্দের চেতনায় এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী অর্থাৎ প্রেম।

সময়কে জীবনানন্দ দাশ বারবারই সেতু'র সঙ্গে তুলনা করেছেন যে সেতুপথে সুসময়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনিশ্চয়তাকেও পুরোপুরি বাদ দিতে পারা যায় না বলে সময়ের বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও অপ্রেমের বাস্তবতারও মুখোমুখি হতে হয়। তবু সৃষ্টির গভীর বোধ প্রেম নেমে আসে, রক্তের ভেতরে মিশে যায়; তখন এমন বোধে আত্মস্থ হওয়া চলে যে 'প্রেম ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।' এই প্রেমকে নিয়েই জীবনের অর্থময়তা প্রকাশ পায়, সৃষ্টির অর্থও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানীর চোখে সময়ের যেমন নির্মোহ, নির্বিকার এবং নির্মম এক প প্রতিফলিত,কবি জীবনানন্দের সময়ও সেখান থেকে খুব একটা পিছিয়ে থাকে না। যে-কবি নির্বিকারভাবে প্রেম বা নারীর মৃত্যুকে অনুভব করার মধ্য দিয়ে সময়ের অস্তিত্ব অনুভব করেন তিনিই আবার 'সময়ের ব্যাপ্তি থেকে আহরিত জ্ঞান নিয়ে মানবিক মননের জরা ও স্থবিরতার অবসান' ঘট ানোর কথা ভাবতে থাকেন। অর্থাৎ জীবনানন্দের চোখে সময় বস্তুজগতের চোখে সময় বস্তুজগতের নির্ভরতা নিয়ে বহু মা ত্রিকতায় সংশ্লিষ্ট।

সময়ের তাৎপর্য কবির চোখে নানা কৌণিক বিন্দু থেকে ধরা পড়ে বলে এর প্রকাশ ঘটে যথেষ্ট বৈচিত্র্য নিয়ে। বস্তুজগতের যে দ্বৈতপ নিয়ে জীবনানন্দের মর্মযাতনা-- যার প্রকাশ ঘটতে পারে একদিকে 'বালিপ্রলেপী মভূমি' আর অন্যদিকে 'ঘাসের প্রান্তর' পে, তাকে সময়ের সেতুপথে বিলীন করে দেবার ইচ্ছায় কবির গভীর সময় চেতনারই এক বিশেষ প্রকাশ ঘটে। যে সময় 'বেলা থেকে অবেলা'র দিকে যাত্রা করে 'অন্ধকার চেতনা নিয়ে বিশৃঙ্খল সময়-সমাজের দিকে চলে যায়' তার জন্যে 'কালবেলা'র পরিণতিই নিশ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কালবেলা সময়-বাস্তবতাভিত্তিক হয়েও সামাজিক বাস্তবতাকেই বড়ো করে দেখে। তাই সময়ের হাত ধরেই কালবেলা থেকে উত্তরণ অর্থাৎ নতুন ভবিষ্যত সময়ে পৌঁছানো সম্ভব।

জীবনানন্দের চোখে সময়ের পান্তর সময়ের 'শাদা-কালো' পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, অনেকটা আলো-আঁধারের প ারস্পরিকতার মত। অদ্ভুত এক বৈপরীত্যের অনুভবে মগ্ন থেকে বস্তুজগতের কণা-প্রতিকণার দ্বন্দ্বকেই যেন ধরতে বা বুঝতে

চেয়েছেন কবি। ফলে আলো-অন্ধকারের মত আশা-নিরাশা, আকাঙ্খা-ব্যর্থতা, প্রেম-অপ্রেম বা আনন্দ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবি জীবনানন্দ অনেকটা বিজ্ঞানীর মন নিয়েই জীবনের সদর্থ এবং সৃষ্টির তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেয়েছেন। এবং এর মধ্যেই অস্তিত্বের সমগ্রতাবোধে পৌঁছতে চেয়েছেন। এ সমগ্রতা সময়, সমাজ, জীবন ও প্রাকৃত পারিপার্শ্বিক নিয়ে।

অবাক হবার নয় যে আজকের বিজ্ঞানীরা স্থানকাল, বস্তুজগতের পারস্পরিকতায় ঐ সমগ্রের সূত্র সন্ধান করছেন সৃষ্টির বিশাল পরিসরে। বুঝতে চাচ্ছেন সৃষ্টির পেছনে নিহিত উদ্দেশ্য, নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানচেতনার আলোয়। এ বিষয়ে সময়ের ধারণা একাধিক মাত্রার প্রকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের প্রতিসমতা, অপ্রতিসমতা, অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে। আর জীবনানন্দ তাঁর ধাঁধাঁর উত্তর পেতে মহাসময়েরই হাত ধরেছেন। শক্তিকে তিনি অনুভব করেন সময়ের প্রেক্ষাপটে বস্তুজগতের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে। পুরনো বস্তুকণার ভাঙ্গনের মধ্যে। পুরনো বস্তুকণার ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে নতুন বস্তুকণার আবির্ভাব দেখতে চান কবি। ভাঙ্গন থেকে শক্তির প্রকাশের মধ্য দিয়ে নবসৃষ্টি তো বহুপরিচিত সত্য। তাঁর কবিতায় এ সত্যই পংক্তির পর পংক্তিতে পরিস্ফুট।

....এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ের ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।

যে-শক্তির গভীর গতিপ্রবাহের তাড়নায় নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য জীবনানন্দ এ ক্ষেত্রে নিজেকেই টেনে এনেছেন এই বলে যে

....হে গভীর গতির প্রবাহ
....আমার শরীর ভেঙ্গে ফেলে
নতুন শরীর করো

এই 'আমি' ধরে নেওয়া চলে যে জীবনলোকের প্রতীক। কারণ 'বেলা অবেলা কালবেলা'র একাধিক পংক্তিতে কবি বিনষ্ট পৃথিবীর পরিবর্তে নতুন সৃষ্টির কথা বলেছেন। সময়ের সেই ভবিষ্যত বিন্দুর গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো বিকল্প নেই তাঁর চোখে

....মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই,
শান্তির আশ্রয় সেই প্রীতিময় স্থানকালের ঝিঁ, যা একদা অমৃতের ঝিঁ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব করে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, ...
যা হয়েছে- যা হতেছে- এখন যা শুভ্রসূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।

সেই মহাজাগতিক 'অগ্নিশিল্প'র কাজ তো (মানবীয় জগতের শিল্পের মতই) নতুন সৃষ্টি সম্পন্ন করা। আর তা করতে হলে সময়ের বর্ধমান বিশৃঙ্খলার (বিজ্ঞানীর ভাষায় 'সময়ের তীর') অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে ঐ ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে বস্তুলোক এবং মানবলোকের জন্ম দিতে

....তা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে পাল্টরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে।

কারণ কবির চোখে পুরোনো পৃথিবীর (যে-পৃথিবী নষ্ট-ভ্রষ্ট) কোনো অস্তিত্ব নেই, আবার 'নতুন পৃথিবীও আসেনি'। সফলতার কোনো সম্ভাবনা চোখে পড়ে না-- 'সফলতা রয়ে গেছে বিজ্ঞানের সজীব পাতায়' সে সফলতা 'জীবনের জন্য আজো নেই।' তাই মানুষের জন্য অন্য কোন বিকল্প নেই সময়ের বিশৃঙ্খলার পথ ধরে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা ছাড়া

যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।
নয়া সৃষ্টির এমন এক স্বপ্ন নিয়ে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার মধ্য দিয়ে কবি'র অন্য এক সম্ভাবনার ভুবন দেখা দেয়, যা বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে নিয়েই দেখা দেয়
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে
আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে-দোর কঠিন; নেই মনে হয়; - সে দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।
সে সম্ভাবনা অবশ্য জন্মের সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েই
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল খেতে
সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।
কিন্তু এই চলে যাওয়া শেষ কথা নয় বলে সময় ক্রমাগত আসে, আর আসে বলেই মনে হতে পারে
কাল তবু- হয়তো আগামীকাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
সময় আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই কক, যেমন নির্মোহ বা নির্মম হোক তবু মানুষ যে সময়ের হাত এড়িয়ে চলতে পারে না এ জীবনসত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের ভাবনায়। কবি বুঝে নেন যে সময় যেন এক নিয়তি যার উপর নির্ভর করেই মানুষকে নিজ অবস্থান তৈরি করে নিতে হবে- তা সময় তাকে কিছু দিতে ইচ্ছা কক বা নাই কক।
নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি;
যতদূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে...
মনে হয় এই আধকণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।
এই ইচ্ছা, এই আকাঙ্খাই সময়কে সঙ্গে নিয়েও সময়কে জয় করে চলার ইচ্ছা প্রতিফলিত করে। কিন্তু কবির শৈল্পিক ধারণায় এসবের সঙ্গে আরো একটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত, আর তা হলো জীবনানন্দের প্রেম-ধারণা, যা তাঁর সমগ্র চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুপে কাজ করে। সে প্রেমের মর্মবিন্দুতে নারীই থাকুক, এই সমন্বয়ক শক্তিই সৃষ্টির প্রধান কথা। এ কথা কবি নিজে যেমন বুঝেছেন তেমনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর পাঠককেও।
চার
জীবনানন্দের চিন্তার জগৎ এভাবেই সময়কে নিয়ে আলোড়িত, আবর্তিত হয়েছে, সময়ের প্রবল প্রভাব অনুভব করেছে যেমন প্রাকৃতিক বস্তুজগতের অসীম বিস্ময়ের দিকে, রহস্যের দিকে তাকিয়ে তেমনি পৃথিবীর, সমাজ ও জীবনের প্রবহমান জটিলতার দিকে নজর ফিরিয়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে-- কেন? তাঁর রোমান্টিক চেতনা, প্রকৃতিতে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকার বাসনা, আকাশ-পৃথিবীর বিস্ময়কর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ওঠার মত বিষয়গুলো কি ঐ কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার কারণ? দিনলিপিতে দেখা যায় প্রায়ই তিনি নক্ষত্র, মেঘ, আকাশের দিকে গভীর বিস্ময়ের বোধ নিয়ে তাকান, তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন হন, তেমনি সময়ের বিভিন্ন বাঁকগুলো তাকেপ্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সময় নানা তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে ওঠে।
আবার অবক্ষয়ে জীর্ণ, কুটিল, স্বার্থপর, অপরিচ্ছন্ন সমাজ এবং সেই সমাজের চাপ তাপ যে কবিকে ক্লান্ত করেছিল, তাঁর মধ্যে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর বোধের জন্ম দিয়েছিল সে খবরও তাঁর কবিতার মধ্য থেকে পেয়ে যান পাঠক। এর প্রতিক্রিয়া তাঁর কবিতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। নিয়ে গেছে হতাশা-নৈরাশ্য থেকে মৃত্যুচেতনার দিকে, যেখানে স্তব্ধতায় শান্তি, অনন্ত সময়ে লীন হয়ে থাকার মধ্যে সর্বপ্রকার যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি।

আর সেই সূত্রে অন্ধকারের সঙ্গে তাঁর এক প্রবল সখ্য গড়ে ওঠে। অন্ধকারকে সত্তায় লালন করাই শুধু নয়, অন্ধকারের নানাকৌণিক গভীরে লালিত হওয়ারও এক আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন কবি। সেখানেও প্রচলিত সময়গ্রন্থি, সূর্য ইত্যাদি সব কিছুই প্রত্যাখ্যান করে অনন্ত অন্ধকারে মিশে থাকতে চেয়েছেন, যা আসলে সময়েরই আরেক অবস্থা। হয়তো তাই এইসব বিপ অবস্থা, বাস্তব ও কল্পনার সংঘাত থেকে কবি জীবনমৃত্যু সময় ও সৃষ্টির রহস্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন, বুঝতে চান বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত এমনি সব অবস্থার পেছনে কোনো সূত্র, কোনো সত্য লুকিয়ে আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে কেমন করেই বা তা জানা যেতে পারে।

এমনি করে প্রচলিত ধারণা থেকেই ভিন্নতর বোধে পৌঁছে যান জীবনানন্দ, তাঁর কবিতার সিংহভাগ চত্বরে সেসব জটিল ভাবনার ছায়া পড়ে, কখনো আলো জ্বলে লাল নীল সোনালি পালি অথবা কমলা রঙের। আবার মাঝে মধ্যে সময় সম্পর্কে প্রচলিত সনাতন ধারণা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সময়কে দেখেছেন স্থির, অপরিবর্তনীয় পরম পে। কিন্তু তেমন ধারণা তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। বরং সময়ের নানামাত্রিক সংশ্লিষ্টতাই তাকে টেনে নিয়ে গেছে ভিন্ন অনুভবের জগতে।

কবিতা থেকে কবিতায় জীবনানন্দ অনুভব করেছেন সময়ের অতীত, অনুভব করেছেন কেমন করে 'আপতিত কাল মানুষ বহন করে'। সময়কে পরম, সুস্থির ভেবে স্থির হতে পারেননি বলে 'সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে মরণের অপরিমেয় ছটা থেকেও এমন উপলব্ধি জন্ম নিতে পেরেছে যে পৃথিবীর জীবন গভীর'। ভেবে দেখার মত, বিস্মিত হবার মতো কবির সময় সম্পর্কে, বস্তুজগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণার এ ধরনের পরিবর্তন এক ভিন্নতর উপলব্ধি যা আধুনিক বিজ্ঞান ধারণা থেকে ভিন্ন নয়।

এমনিভাবেই দেখা যায় অন্ধকার নিয়ে গভীর নেতিবাদী চেতনার পরিবর্তন। কবি অনুভব করেন'গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।' এ অনুভব এতটাই বিজ্ঞাননির্ভর, বস্তুসত্য-নির্ভর যে জীবনানন্দ ঠিকই দেখতে পান বিশ্ব, প্রাকৃত জগৎ এবং মানব ভুবনের বিজ্ঞানসম্মত উদ্ভব। 'বীজের ভেতর থেকে অরণ্য, জলের কণা থেকে নভোনীল মহান সাগর এবং সেই প্রাকৃত স্থানকালের মধ্যে প্রথম জীবনের উদ্ভব' সব কিছুই আশ্চর্য এক সত্যের প নিয়ে চেতনায় ফুটে ওঠে।

এমন কি এ বিশ্বাসও সেই সূত্রে জেগে ওঠে যে 'এইসব ব্যাপ্ত অনুভব থেকেই মানুষের মন তার চারিদিকে উপস্থিত অস্থিরতা, ব্যথা, বাধা, ভয় ইত্যাদি অতিত্রম করে প্রবল এক আশার আশ্রয় তৈরি করে গেছে।' অবশ্য সে আশার পেছনে রয়েছে মানুষের সহজাত বোধ থেকে তৈরি জ্ঞানের আলো, সততা আর মানুষের জন্য সব মানুষের ভালোবাসা। কিন্তু সময়ের দিকে বাস্তব চোখে সাদা চোখে তাকিয়ে কবি কিন্তু আশা-নিরাশার মধ্যে দ্বিধা আর সংশয় নিয়ে বারবার দোলায়িত হয়েছেন এই ভেবে যে-- ঐ উত্তরণ কতটা সম্ভব? এই প্রশ্ন সত্ত্বেও আবার এমন প্রত্যয়ও ব্যত্ত করেছেন যে সব কিছু যদি ঠিকমত চলে তাহলে মানুষ উজ্জ্বল সূর্যের অনুভব নিয়ে সময়ের নতুন তীরে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

আসলে জীবনানন্দ দাশ তাঁর শৈল্পিক বোধ নিয়ে অবাস্তব আশার জগতে বাস করতে চাননি। বস্তুজগৎ ও সৃষ্টির বিভিন্ন দিকে তাকিয়ে সময়ের আশ্চর্য প্রভাব প্রকৃতি থেকে মানব জীবনের ওপর লক্ষ করে তিনি স্বাভাবিকভাবে এমন বিশ্বাসে স্থিত হন যে এ সবকিছুই আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত, নিজস্ব নিয়মের অধীন। সময়ও তাই মানুষের প্রয়োজন নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে তার নিয়ম মতই চলে।

জীবনানন্দের সময়-ধারণা বস্তুজগতকে নিয়েও আধুনিক বিজ্ঞানীর স্থানকাল-নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তুজগতের ধারণার বিদ্ধে দাঁড়ায় না। বরং সময়কে নিয়ে বস্তুজগতের মধ্যে সব কিছুর একটা অস্তিত্বগত সমগ্রতার আকাঙ্খা তার চেতনায় বড়ো হয়ে ওঠে। তবু বাস্তব পৃথিবীর সব কিছু দেখে কখনো কখনো সময়ের ওপর আস্থা ধরে রাখা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও আশার আলো চোখে নিয়ে ভবিষ্যত সময়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন কবি, যে সময়কে মানুষ এখনো দেখে নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তবু তাকে অনেক পথ হাঁটতে হবে-হতে পারে তা বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো নক্ষত্র বা তার গ্রহের দিকে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com